ইনশাল্লা

শুনলাম, এক পরিবারে বড় ছেলের নাম আওজুবিল্লা, মেজো ছেলের বিসমিল্লা, আর ছোট ছেলের নাম সোবহানাল্লা। মনে মনে বললাম, আলহামদুলিল্লা। সাথে একটা দোয়াও পড়ে ফেললাম যেন খোদাতালা এই পরিবারের ছেলেগুলিকে কখনো আমেরিকার ইমিগ্রেশন কাউন্টারে না পাঠান। তৌবা, কি বলে ফেললাম। খোদা ! খোদার নাম যে পাকাপাকিভাবে আল্লা হয়ে গেছে সেটা বারবার ভুলে যাই। পরিবারটির নিবাস কোথায় তা হয়ত বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে পাঠকের। ক্যানাডার এই নাসারা শহরেরই কোন এক পল্লীতে। শহরটার নাম অবশ্য নাসারা নয়, এর আদি বাসিন্দাগণই কেবল। পল্লীটি বাঙালিমহলে বাংলাদেশী পাড়া বলে আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখানে বাংলাদেশী মাছ থেকে শুরু করে শীলপাটা, পানসুপুরি, লোটাবদনা, আলোয়ানতবন, বোরখা কামিজ আর আমিত্তি সিঙারা সবই পাবেন। বাংলাদেশে যারা ভাল মাছ খেতে পান না তাদের অনেকেই আজকাল বছরে বছরে একবার দু'বার ক্যানাডাবাসী ছেলেমেয়ের কাছে চলে আসেন বড় বড় পেটিওয়ালা দেশী মাছ খাওয়ার জন্যে।

পাশাপাশি আরেকটি পরিবারের কথা জানি যারা রবীন্দ্রনাথের দু'চারটে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, জীবনানন্দ দাশের নাম শুনেছে, এবং শামসুর রাহমানকে নিয়ে গর্ববোধ করে। তারা মেয়ের নাম রেখেছে তরুলতা, ছেলের নাম কৃষ্ণচূড়া। কল্পনা করতে চেষ্টা করি ওরা হাইস্কুলে গেলে সহপাঠীরা কি নামে ডাকবে ওদের। তরুলতাকে হয়ত বানাবে লেটি, আর বেচারী কৃষ্ণচূড়াকে ক্রুশবিদ্ধ না করলেও ক্রিস না বানিয়ে ছাড়বে না। এদেশের ছেলেমেয়েদের জিহ্বাতে কি একটা ব্যাপার আছে যাতে আমাদের দেশের নামধাম তারা একেবারেই উচ্চারণ করতে পারে না। আমার দুই ছেলের দু'অক্ষরের নাম রেখেছিলাম এই ভেবে যে এগুলোকে বিকৃত করার প্রয়োজন হবে না, বাবু আর রাজা। এর চেয়ে সোজা নাম আর কি হতে পারে। কিন্তু বিকৃত তারা করে ফেলল ঠিকই। বাবু হয়ে গেল ব্যাব্স্, রাজা রজার। অবশ্য এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে অন্ধ্রপ্রদেশ আর শ্রীলঙ্কার বাবুদের নাম উচ্চারণ করতে আমার নিজেরই বারোটা বেজে যায়। আমার দু'জন বন্ধু আছে দক্ষিণভারতের যাদের দলিলি নাম কোনদিনই উচ্চারণ করতে পারিনি আমি, চল্লিশ বছরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের পরও। সুতরাং আমাদের নাম নিয়ে যদি এদেশের লোকেরা হাবুডুবু খায় তাতে মন খারাপ করার কিছু নেই। তবে আমার মতে, এদেশে যদি স্থায়ীভাবে থাকতেই হয় তাহলে ছেলেমেয়েদের নাম দিয়ে কাব্যরস বা ধর্মবোধ প্রচারের চেষ্টা না করে যথাসম্ভব ব্যবহারযোগ্য রাখাই ভাল।

প্রবাসের চেহারা এখন আগের মত নয়। আগে আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানে কেক কাটা হত। এখনও কেক কাটা হয়, তবে তার সাথে মিলাদও পড়ানো হয়, গোলাপের পানি ছিটানো হয়। এবং মিলাদ পড়াকালে দেয়ালের সব ছবি তুলে ফেলা হয়। এমনকি কার্পেটে কোনরকম নকশাটকশা থাকলে মৌলবীসাহেবের অনুরোধে সেটাকে দলামলা করে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে যারা বিজয় দিবসে জয়বাংলা গাইত, এখন তারা কোরাণ তেলোয়াত করে। আগে নতুন বাড়িতে ওঠার পর পার্টি দেওয়া হত, এখন সতরঞ্চি বিছিয়ে হাজীসাহেবকে দিয়ে দোয়া পড়ানো হয়। আগে কারো ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় ভাল করলে লোক ডেকে ডালভাত খাওয়ানো হত, এখন মিলাদের পর শিরনি খাওয়ানো হয়। কারো মা হতে যাওয়ার খবর পেলে বন্ধুরা দল বেঁধে বেবি শাওয়ারের আয়োজন করত আগে। এখন তারা মিলাদ পড়ায়। যারা গানের আসরে গিয়ে তবলা বাজাত আগে, বা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত তারা এখন ইফতার পার্টিতে গিয়ে হিজাব পরে নাত গায়। আমি দেশে থাকাকালে, কৈশোরে যৌবনে কোনদিন কাউকে 'হালাকা' শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনিনি। ক্যানাডায় এসে বসতি স্থাপন করবার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর পর পর্যন্ত ও-শব্দ কানে আসেনি। তারপর হঠাৎ করেই যেন নাজেল হয়ে গেল তিন অক্ষরের এই মহান শব্দটি। এর অর্থ আমি এখনো ভাল বুঝি না। ভাল বোঝে এমন কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে দেখাও হয়নি আজ অবধি। অথচ উত্তর আমেরিকার এমন কোন শহর নেই যেখানে একটা শক্তসমর্থ হালাকাগোষ্ঠী তৈরি হয়ে ওঠেনি। এদের অনেকেই একসময় প্রগতি করতেন, সাম্যবাদ গাইতেন, শুদ্ধ বাংলায় কবিতাও লিখতেন কেউ কেউ। আমি যতদূর জানি হালাকা নিয়ে কাব্যরচনা করার চেষ্টা এখনো করেনি কেউ। হালাকা কোনও বাংলা শব্দ নয়, তবে ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে বাংলা অ্যাকাডেমীর শব্দকোষে একদিন স্থান পেয়েও যেতে পারে। সম্ভবতঃ হালাকা কোন আরবি শব্দও নয়। এক ইহুদী বন্ধুর কাছে জানলাম, শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু ভাষাতে—যার মূল অর্থ হল ধর্মীয় আলোচনা। তাই বলি, ইহুদী প্রচলন না হলে আমরা পাব কোত্থেকে। রোজা, হালাল, খতনা, এগুলি ইহুদীদের কাছ থেকে নিতে পারলে হালাকা নিতে দোষ কি। আমার সমস্যা সেখানে নয়।

সমস্যা হল, প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যা আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা হঠাৎ করে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে কেন। বিশেষ করে দেশ ছেড়ে খ্রীষ্টান আর ইহুদীদের দেশে এসে আশ্রয় নেবার পর।

আজকাল দেশে গিয়ে ক'দিন থাকার পরই কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা দাঁড়ায়। মনে হয় যেন চারদিকের সব দরজা জানালা শক্ত করে আটকে ফেলা হয়েছে। একে তো দূষিত বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, আকাশের নীল রং যেন চিরতরেই মুছে গেছে, তার ওপর প্রতিদিন রাত প্রভাতে মোরগের ডাক আর মুয়াজ্জিনের ডাক একই সাথে সারা জাহান ফাটিয়ে তোলার উপক্রম করে। আমার যৌবনে আমাদের স্বাধীনতা ছিল আজান শুনে লেপ মুড়ে ঘুমোতে থাকার। এখন সে-স্বাধীনতাটুকু প্রায় নেই বললেই চলে। এখন আপনি তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে নামাজে না দাঁড়ালে আপনার নিকটতম আত্মীয়রাও এমন করে তাকাবে আপনার দিকে যেন লেজার বীমের আগুন ছোড়া হচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলমান এখন আল্লার নাম না নিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পায়। উঠতে আল্লা, বসতে আল্লা, চলতে আল্লা, বলতে আল্লা। ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে কোন উক্তির আগে তাদের ইনশাল্লা বলতে হবে, পাছে আল্লা রাগের বশে তার প্ল্যান পরিকল্পনা সব পণ্ড করে দেন। কোন শুভকাজ সারা হয়ে গেলে আলহামদুলিল্লা তাকে অবশ্যই বলতে হবে পাছে না আল্লাতা'লা তাকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তারা বেআইনী কাজ করার আগে ইনশাল্লা বলবে, কাজ সারা হলে বলবে আলহামদুলিল্লা। হরকতুল মুজাহেদিন বা শিবিরের খুনীরা শত্রুনিধনের আগে-পরে এমনি করে আল্লাকে স্মরণ করে কিনা জানি না, তবে কল্লা কর্তনের পূর্বমুহূর্তে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারিত হবার দৃশ্য তো দূরদর্শনীতেই আমাদের দেখতে হয়েছে একাধিকবার। বাংলাদেশের মানুষ যেন বিশ্বাসই করতে পারে না যে তাদের নিজেদের ইচ্ছায় কোন কাজ করা সম্ভব—সবই আল্লার ইচ্ছা। ভালই হোক আর মন্দই হোক। স্কুলগামী ছেলে রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে মারা যায়, আল্লার ইচ্ছা , পাড়ার মাস্তান ষোড়শীর মুখ পুড়িয়ে দেয় অ্যাসিড ছুড়ে, আল্লার ইচ্ছা , মায়ের একমাত্র সন্তানকে মেরে ফেলে সন্ত্রাসীরা, আল্লার ইচ্ছা। আপনি মেয়ের বিয়ে দেবেন, আল্লার ইচ্ছা , এক বউ রেখে দ্বিতীয় বউ বিয়ে করবেন, আল্লার ইচ্ছা। ল্যাবে গিয়ে গবেষণা করবেন, তা'ও আল্লার ইচ্ছা। এ-জাতির দারুণ বিশ্বাস আল্লার ওপর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের ওপর কতখানি তা ভাববার বিষয়। এবং আত্মবিশ্বাস ছাড়া কোন জাতি কখনোই বড় কিছু করতে পেরেছে কিনা সমগ্র মানবজাতির জন্য তা ইতিহাস ঘাঁটলেই জানা যাবে।

মুশকিল শুধু গোঁড়া বিশ্বাসীদের নিয়ে নয়, গোঁড়া অবিশ্বাসী এবং তথাকথিত প্রগতিশীলদের নিয়েও। অর্থাৎ তথাকথিত মুক্তমনা, মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচেতন—ইত্যাদি নানা বিশেষণযুক্ত, উচ্চমার্গের সম্প্রদায়টিকে নিয়ে। কিঞ্চিৎ লজ্জার সাথে স্বীকার করছি যে আমি নিজেও সেই দলের অন্তর্গত। আমাদের একটা চলতি বুলি যে বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা নেই। ধর্মভীরুতা আছে, ধর্মপরায়ণতা আছে, কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামি নেই। তাঁরা নিজেরা গোঁড়া নন, অন্তত ধর্মের ব্যাপারে, সেটা মানি, কিন্তু এক হিসেবে অন্ধ তাঁরাও, এবং আমিও—আমাদের বিচারবুদ্ধিতে। এটা অনেকটা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' জাতীয় একটা উদ্ভট উক্তিকে (যা ৭০/৮০ বছর আগে কিছুটা যুক্তিযুক্ত হয়ত ছিল, কিন্তু এখন একটা হাস্যকর বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়) বেদবাক্য মনে করে বারবার প্রচার করে যাওয়ার মত। ৬০/৭০ বছর আগে আমাদের দেশে আসলেই ধর্মান্ধতা ছিল না। তখন সহনশীলতা বলে একটা জিনিস ছিল। ভদ্র মার্জিত আচরণ বলে একটা জিনিস ছিল। ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন মতের প্রতি সম্মানবোধ ছিল। ছিল এজন্যে যে তখনো মরুভূমির দেশ সৌদী আরবের কালো তেলের বিষাক্ত বাষ্প আমাদের সমাজকে কলুষিত করে ফেলেনি, বা 'ইসলামিক রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ কল্পনা আশ্রয় নেয়নি মানুষের চিন্তায়। সেকালে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না। অকল্পনীয় দারিদ্র্য, অনাহার অর্ধাহার, রোগ মহামারি মৃত্যু—এই ছিল গ্রামবাংলার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের চালচিত্র। সে তুলনায় আজকের মানুষ অনেক বিত্তশীল। অথচ আজকের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মানুষদের একটা জিনিস প্রায় নেই বললেই চলে যা আগেকার অসহ্য দারিদ্র্যভারাক্রান্ত মানুষদের ছিল প্রচুর পরিমাণে—মানসিক উদারতা, সহ্যগুণ, মায়ামমতা। সোজা কথায় মনুষ্যত্ব। আগেকার মুসলমান কোন অংশেই কম ধার্মিক ছিল না আজকের তুলনায়, কিন্তু আজকের মত জোরজবরদস্তী ছিল না সে-সময়। আগে ফজরের আজান দিয়ে সমস্ত গ্রামের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা হত না, এখন হয়। বিদ্যুতের তার গ্রামে ঢোকার সাথে সাথে এসে গেল মাইকে করে আজান হাঁকার বাতিক। আপনি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে চান বা না চান, আপনাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। নইলে আপনাকে অচিরেই সমাজচ্যুত হতে হবে। আগে বেলা গড়াবার পর হিন্দুপাড়া থেকে উলুধ্বনি শোনা যেত। আমার খুব ভাল লাগত শুনতে। এখন সে-পাড়াতে কোন হিন্দু নেই, কারণ তারা প্রাণের ভয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এখন কোন উলুধ্বনি নেই বাংলাদেশে, ধূপধুনা নেই সাঁঝের বেলায়, কাঁসর ঘণ্টা বাজে না মন্দিরে মন্দিরে, গীর্জায় বাজে না প্রার্থনার ঘণ্টা প্রতি রোববার। এখন শুধু আজান আর আজান আর আজান। ধর্মান্ধ যদি না'ই হয়ে থাকি আমরা তাহলে আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে একটি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন হল কেন, যা আধুনিক পৃথিবীর কোন উন্নত দেশে নেই ?

ধর্মান্ধ না হলে প্রতিদিন টেলিভিশনের অনুষ্ঠান চলাকালে আজানের ধ্বনি বেজে উঠবে কেন পাঁচবার ? ধর্মান্ধ না হলে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির বিশ্বে মৌলবী-সাহেবদের চামড়ার চোখের ওপর নির্ভর করতে হবে কেন ঈদের চাঁদ দেখার জন্যে ? ধর্মান্ধ যদি না'ই হই তাহলে মাদ্রাসার ডিগ্রি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে সমান মর্যাদা দেবার দাবি এত জোরদার হয়ে উঠবে কেন ? না ভাই, ধর্মান্ধ শুধু আমাদের দেশ নয়, প্রতিটি মুসলমান দেশেই ধর্মকে নিয়ে এইরকম বাড়াবাড়ি। এটাই আমাদের পশ্চাদপদতার সবচেয়ে বড় কারণ, অন্তত আমার মতে।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা মৌলিক বিরোধ আছে সেটা আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব আর ধর্মবাদীদের সৃষ্টিতত্ত্ব তার অন্যতম উদাহরণ। বিজ্ঞানের মূল স্তম্ভ হল প্রশ্ন, বিতর্ক, পরীক্ষানিরীক্ষা, যুক্তি। ধর্মে এগুলোর কোনটারই প্রশ্রয় নেই। আমাদের ইসলাম ধর্মের শুরুতেই হল ঈমান, অর্থাৎ বিশ্বাস। ওটাই স্তম্ভ, ওটাই ইমারত। এতে কোনও 'কেন', 'কিন্তু', 'যদি', বা 'তবে'র জায়গা নেই। অথচ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেকেই মানতে রাজী নন যে তাঁদের বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের ধর্মের কোন বিরোধ আছে। বরং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানে এমন কিছু আবিষ্কার হয়নি যা পবিত্র কোরাণে নেই। আমি আরবি বুঝি না বলে মূল কোরাণ পড়ে তার রস আহরণ করবার সৌভাগ্য হয়নি, তবে গুটিকয়েক ইংরেজি তরজমার কোথাও আমি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব, মেণ্ডেলিভের পিরিওডিক টেবিল, গ্র্যাহাম বেলের টেলিফোন, মার্কনির রেডিও বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের কোনও উল্লেখ দেখিনি। হতে পারে যে আমি কোরাণের সাঙ্কেতিক ভাষা একেবারেই বুঝি না। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, সব তত্ত্ব যদি সত্যি সত্যি কোরাণে লেখা থাকত তাহলে আজ পর্যন্ত কোনও মুসলমান বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্রে কোরাণের উদ্ধৃতি দেখিনি কেন। কোন মুসলমান বিজ্ঞানী শুধুমাত্র কোরাণের জ্ঞান দিয়ে কোনও বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্ব বা সূত্র আবিষ্কার করতে পারেননি কেন। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম পরিবারে রোজ একবার কি দু'বার কোরাণ তেলোয়াত হয়, যদিও তার অর্থ বোঝে না প্রায় কেউই। কিন্তু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই গ্রন্থটি পৃথিবীর সব জ্ঞানের আকর, সব আলোর আধার। অর্থাৎ কোরাণ জানলে আর কিছু জানবার প্রয়োজন হয় না। আমার বিজ্ঞানপড়া মনে তখন প্রশ্ন ওঠে ঃ তাই যদি হয় তাহলে মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং কেন বলেছিলেন, জ্ঞান আহরণের জন্যে প্রয়োজন হলে তোমরা চীনদেশে যাবে। এই মূল্যবান এবং অর্থপূর্ণ উপদেশবাণীটি আমি নিজে পড়িনি কোথাও, তবে আমার একাধিক ধর্মপ্রাণ বন্ধু আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে কথাটা সত্য—এটা রসূলে করিমেরই উক্তি। তাই যদি হয় তাহলে চীনদেশে কোন্ জ্ঞান আহরণের কথা বললেন তিনি যা কোরাণে নেই ? দুঃখের বিষয় যে মুসলমানেরা তাঁর এই উপদেশটি কার্যক্ষেত্রে গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করেছিল মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রীষ্টানরা, যার কারণে চীনের আবিষ্কৃত মুদ্রণযন্ত্র মুসলিম জগতে না গিয়ে গিয়েছিল বিধর্মী খ্রীষ্টান জগতে, যদিও সেকালে সারাবিশ্বের সেরা শক্তি ছিল তুরস্কের মুসলিম রাজত্ব। সেই যন্ত্রের সাহায্যে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা লক্ষ লক্ষ বাইবেল ছাপিয়ে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন যীশুর বাণী, আর আমাদের পীরদরবেশ আর রাজাবাদশা'রা দোয়াত কলম নিয়ে কোরাণ নকল করে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করলেন।

মৌলবীসাহেবরা বলতে ভালবাসেন যে আধুনিক বিশ্বের মুসলমান জাতির এত দুর্দশার কারণ, তাদের ঈমান নাই। আমি বলি ঠিক তার উল্টো। ঈমান ছাড়া আর কিছু নেই বলেই আমরা এত পশ্চাদপদ।